প্রহাণ

তিলোত্তমা মজুমদার

আ ন ন্দ

আমাকে মারিস না, আমাকে মারিস না ভাই, আমি তো তোর বন্ধু নাকি বল্? হ্যাঁ? বন্ধু না? মারবি আমাকে? মারবি তুই সুজয়? স স সত্যি মারবি? কী রে হ্যাঃ? হ্যা হ্যা হ্যা ...

পেছনে ক্রমশ এগিয়ে আসছিল একটি দেওয়াল। এবং দেওয়ালের গায়ে গণতন্ত্র বা সমাজবাদ বিষয়ে কিছু লিখন। এবং লিখনের থেকে গড়িয়ে পড়া রং মিশেছিল যে-নর্দমায়, দেওয়ালের পাদদেশে চওড়া ও দু'ফুট গভীর, এগিয়ে আসছিল এমনকী সেই নর্দমাও, আর পথ সরে যাচ্ছিল, পথের কিনার, অসম্ভব শত্রু মানসিকতায় সরে যাচ্ছিল পায়ের তলা থেকে, আর তাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছিল— হ্যা হ্যা হ্যা ...

হ্যা হ্যা হ্যা ... তোকে স্কুল থেকে চিনি আমি, চিনি না? বল্ তুই আমার ন্যাঃ-ন্যাংটো-পোঁদের বন্ধু না? মারবি? আমাকে মারবি? এই এই সুজয়। আমি সরে যাব, মাইরি বিশ্বাস কর্, পার্টি ছেড়ে দেব, মায়ের দিব্যি, মা, আমার মা, মাগো, ও মা! সু-সু-সুজয়, আমার মায়ের কথা ভাব্, আমি না থাকলে মা কী করবে? আঁক্ ওঁক্ খ খ খকৎ ...

এখানেই তার কথা শেষ হয়ে গিয়েছিল। এরপর ইহলোকে প্রাপ্ত তার শরীর থেকে আর মাত্র কয়েকটি শব্দ নির্গত হয়, বিনাশের ঠিক পূর্ববর্তী কালে এ এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়ামাত্রের শব্দ— গ্লব্ ফি জ্ জ্ জ্ ... ভু স্ স্ স্ ... এবং শব্দের সঙ্গে অবধারিত কিছু রক্ত ভলকে বেরিয়েছিল, গড়াতে থাকছিল, গড়িয়ে নেমে কিছুক্ষণ পর মিশে যেতে থাকছিল নর্দমার জলে। অতঃপর যখন তার শরীর প্রাণবিবর্জিত অবস্থায় অশক্ত ও ভারসাম্যহীন, ক্রমশ তার পিঠে লেগে যাওয়া দেওয়াল হেঁচড়ে সে পড়ে যাচ্ছিল, আর পায়ের তলার পথ, যা বিশ্বাসঘাতকতাবশত তার পা দুটি শূন্যে তুলে দিয়েছিল, সেইসব ছেড়ে সে নর্দমায় পড়ে যায় একটি কার্তেসীয় কূপের আকারে। এবং জলে তার ছিন্ন কণ্ঠনালী ডুবে যায় যার দ্বারা সে বহু পরিকল্পনার বাক্য উচ্চারণ করেছে এতকাল। চোখজোড়া, যা শত্রু ও মিত্র চিহ্নিত করত, বিস্ফারিত হয়েছিল, বন্ধ হয়নি এবং সেই বিস্ফার সমেত কাদাজলে ঢেকে যাবার আগের মুহূর্তে, ঠিক

আগের মুহূর্তে, সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় আজও মনে করতে পারেন, দেখেছিলেন সুস্পষ্ট জলরেখা। পুলক কাঁদছিল।

কাঁদছিল কি? এই নিয়ে আজও বিভ্রম। কাঁদছিল? পুলক? কেন? মায়ের জন্য। ধুর্! মৃত্যুর আগের মুহূর্তে কেউ মায়ের জন্য কাঁদে না। স্ত্রীর জন্য, সন্তানের জন্য কাঁদে না, কাঁদে নিজের জন্য!

নাকি, ভুল হল, সম্পূর্ণ ভুল! নিজের কথা মনে থাকে না তখন। 'আমি' মনে থাকে না। 'আমার দেহ' মনে থাকে না। শুধু 'ওদের' কথা মনে হয়। ওদের কথা, ওরা, যাদের সঙ্গে মায়া জড়ানো, যাদের নিয়ে স্মৃতি, যাদের জন্য এ জীবন স্বপ্নাতুর ও সুকাম্য। কত প্রগাঢ় এই মায়া, তার যথার্থ উপলব্ধি হয়তো তখনই হয় যখন মৃত্যু আসে। তাই কান্না পায়। চিরবিচ্ছেদবেদনা শুধু ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেই অনুভব করা সম্ভব। এবং সে-অনুভব বর্ণনা দুঃসাধ্য। মৃত্যুর আগমন প্রত্যক্ষ হলে কান্নার তরল অভিব্যক্তি চোখের গোচরে আসে। মৃত্যু, মানে শেষ, মানে নেই হয়ে যাওয়া। যে-আমি আছে তার নেই হয়ে যাবার প্রাক্‌মুহূর্তের উপলব্ধি কত তীক্ষ্ণ? কতখানি দুঃসহ? একমাত্র কান্নাই তা ব্যক্ত করতে চায়। তবে অর্থহীন। কেননা এ চাওয়ামাত্রই। অন্য কোনও ব্যক্তি, যার সেই মুহূর্তে মৃত্যুর সম্ভাবনা নেই, সে প্রত্যক্ষ মাধ্যমে যন্ত্রণার আংশিক নেয় মাত্র। আংশিক। সামান্য। সূচ্যগ্র। এমনকী বিশ্বাসও করে না। অশ্রুলিখিত ভাষা বিশ্বাসও করে না। এমনও ভাবতে পারে, আয়ুর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসতে থাকা ওই অশ্রু কোনও উপলব্ধির ভাষান্তর নয়, কোনও সচেতন অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ নয়, শরীরযন্ত্রের এ এক অন্তর্গত প্রক্রিয়া, যা, কিছু অশ্রু, অন্তিমকালে উৎপন্ন করে। এই অশ্রুকে কি কান্না বলা যায়? ধূলি দ্বারা নির্যাতিত চোখ যে জল নির্গত করে, তা কি কান্না?

অতএব অন্যান্য যতবার ভেবেছিলেন, তারই মতো, আজও, সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না যে পুলক কাঁদছিল কি-না। সম্ভব হলে, একমাত্র মৃত পুলকই একথার যথাযথ উত্তর দিতে পারত। কিংবা, এ-ও হলফ করে বলা যায় না যে পারতই। মৃত্যুর মুহূর্তে মস্তিষ্ক তার ক্রিয়াদি বিষয়ে কতখানি সতর্ক থাকতে সক্ষম হতে পারে, যার মাধ্যমে মৃত পর্যন্ত অনুভূতির সার্বিক বর্ণনা দিতে পারবে এমন প্রত্যাশা করা যায়? তথাপি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় একবার প্রশ্ন করলেন— পুলক, তুই এখন কোথায়?

ক্যাঁ-অ্যা-অ্যা-চ! সশব্দে গতি সামলে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় জাড্যধর্ম অনুসারে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। মঞ্জিল দাঁতে

দাঁত পিষছে। শালা! শেয়ালকাঁটার ঝাড়। শালারা সব মরার জন্য জন্মায়!

সুজয় উঁচু হয়ে তাকালেন। চাকার এক ইঞ্চি দূরে চার বছরের বালক। নোংরা। ন্যাংটো প্রায়। বড় বড় চোখে বিস্ফার। ঢোঁক গিলছে। তার কণ্ঠনালী সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিগোচর হল। তার চারপাশে ছড়ানো টিকিট। বাসের ফেলে দেওয়া টিকিট। ও কুড়িয়ে নেয়। কুড়োচ্ছিল। সুজয় দ্রুত জানালার কাচ নামালেন।

—মরে যেতে পারত। বেঁচে গেল জাস্ট। দেখে চালাবেন তো?

সুজয় তাকালেন। একটি মেয়ে। মঞ্জিল ঝাঁঝাল— আমার দোষ? লাফিয়ে পড়ল চাকার ওপর।

—আয় রে!

মেয়েটি চলে যাচ্ছে। ছেলেটির হাত ধরে টেনে নিল। হাত মুচড়ে ছাড়িয়ে নিল বালক। ছুট লাগাল। পেছন ফিরে তাকাল একবার, আর ছুটতে থাকল। যেন, ওই গাড়ি, তাকে চাপা দিয়ে যেতে পারে ফের। যেন সে-এক পুলক বিশ্বাস কিংবা, যা হোক, অন্য কোনও প্রাণ, যে গাড়িতে সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখামাত্র ছুটছে, পুনরায় প্রাণ সংহার সম্ভাবনার কল্পনা ও ত্রাসে।

মঞ্জিল চলতে শুরু করল আবার। সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় পেছনের সিটে গা এলিয়ে দিলেন। ভাবতে থাকলেন। কেন-না গাড়িতে চলার কালে মঞ্জিলের হাতে তিনি জীবন সমর্পণ করে দেন। এবং ভাবেন। ক্রমান্বয়ে। কোনও যুক্তির বুনোট। কিংবা কোনও অসংলগ্ন কল্পনা। কিংবা অকারণ আত্মনির্মাণ ও আত্মনাশ!

অতএব, সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবতে থাকছেন। আরও এক পুলক। আরও এক পুলক বিশ্বাস। ইতিপূর্বে দেখেছেন আরও। একজন পুলকের বিনিময়ে আরও অসংখ্য পুলক। এবং পুলকেরা পৃথিবীতে ফিরে এসেছে— এই বোধ তাঁকে তৃপ্তি দিল। অন্যান্য দিনেরই মতো, বিষাদের বিবর্ণতা ঝেড়ে ফেলে দেখলেন জনবহুলতা। মানুষ— তাঁর ভাল লাগে। অজস্র অসংখ্য মানুষ— তাঁর ভাল লাগে। তিনি জানালার কাচ তুলে দিলেন। হঠাৎ, ঝলকে মনে পড়ে গেল, পুলকের বাঁ হাত সামনে উঠে এসেছিল। আত্মরক্ষার উঠে আসা। আক্রমণের নয়। আক্রমণের কোনও চেষ্টাই পুলক করেনি। কেন করেনি? তার অনেক কারণ থাকতে পারে। অদূরেই দাঁড়িয়ে ছিল জয়শঙ্কর। যে উদ্যত ছিল, কোনও বিপদ বা প্রতিকূল পরিস্থিতি এলে সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগলে নিয়ে যাবে। কিংবা, হয়তো, সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতের ক্ষুর তাকে এত

ভীত করেছিল যে, সে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা ভাবতেও সাহস করেনি। কিংবা, আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ গড়ে তোলা এক দীর্ঘমেয়াদি মানসিক প্রস্তুতির ফল। পুলক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ক্ষুর উঠে আসা এতখানি অবাস্তব ছিল যে প্রতি-আক্রমণের প্রস্তুতি পুলকের ছিল না। সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র তুলি ও কলম ধরতেই সক্ষমতার পরিচয় দেয়— এমনই বিশ্বাস থেকে নিজস্ব শক্তি ও বুদ্ধির প্রতি তার ভারী আস্থা জন্মেছিল। কিন্তু এর পরেও কিছু কথা থেকে যায়। প্রতিরোধ বা প্রতি-আক্রমণ যে-কোনও ইতর প্রাণীর ন্যায় মানুষেরও সহজাত প্রবণতা। পুলকের কি তা-ও সক্রিয় ছিল না?

না, না! সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মাথা নাড়েন। সহজাত প্রতিরোধ প্রবণতা থেকেই ওই হাত উঠে এসেছিল। কিন্তু দুর্বল প্রতিরোধ। কিছুক্ষণ আগে যা তিনি আরও একবার প্রত্যক্ষ করেছেন এবং ওই প্রত্যক্ষদর্শন তাকে পুলকের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। এবং তৎপরবর্তী ভাবনাসমূহ, যা বা যে-রকম তাঁর ক্ষেত্রে বার বার ঘটে থাকে— কোনও প্রসঙ্গ বা কোনও ঘটনার অনুষঙ্গ তাঁকে অতীতের নিকটবর্তী করে দেয়। কিন্তু কোনও ঘটনা যখন বর্তমান কালে অবস্থান করে তখন তা ঘটনামাত্র। অতীত হতে থাকাকালীন সে-ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ ও বহুমাত্রাযুক্ত হতে থাকে। সেই ঘটনা তখন বিশ্লেষণের উপাদান। কার্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করে মানুষ ঘটনা দ্বারাই নির্মাণ করে বিধি, বিধান বা সিদ্ধান্তসমূহ। এবং অতীত অভিজ্ঞতা প্রদান করে। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান মানুষের বর্তমানে ও ভবিষ্যতে প্রযুক্ত হয়। এমনকী অতীত মানুষকে নিজের মুখোমুখি করে যা তাকে নিজ-সম্পর্কে কিছু আলোচনার সুযোগ দেয়।

সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে অতীত বর্তমানেরই মতো সজীব ও বিশ্লেষণাত্মক। গভীর অনুভূতিসম্পন্নও তারা কারণ বর্তমানের সামান্য প্ররোচনায় তারা জেগে উঠতে থাকে। এই কিছুক্ষণ আগে যেমন হল, অরবিন্দ সেতুর কাছে জ্যামে গাড়ি আটকে গিয়েছিল। আর তিনি বাইরে তাকিয়েছিলেন। এক রাগি মা তার মেয়েকে মারছিল। মায়ের বয়স অনুমান করা শক্ত। দারিদ্র্যের দীর্ঘ সংগ্রাম তাকে ক্ষয়াটে পরিণতি দিয়েছে। সেই পরিণতির তলায় ধ্বস্ত প্রকৃত সময়, রাগি মাতৃদেহত্বকের প্রকৃত বয়স। আর মেয়েটি ছোট, বছর চারেক। সেও কি পুলকের নবজন্ম? হতে পারে। নাও হতে পারে। পুলকের কিংবা অন্য কারও। হতে পারে। নাও হতে পারে। যদি হয়, ধরা যাক ওই বালক পুলকের আত্মাজাত, এই মেয়েটি, প্রহৃত মেয়েটি

পুলকের আত্মাজাত— ধরা যাক এরকম আরও অনেক, নির্যাতিত-বিপন্ন-অবহেলিত-দরিদ্র— ধরা যাক, এমনই ধরা যাক, তবে এ কি সত্য, এ কি সত্য যে একজন মানুষের আত্মা বিভাজিত হয়ে বহু মানুষে পরিণত হতে পারে? একজন মানুষের মৃত্যু বহুজনের জন্মের কারণ? এ কি সত্য যেমন রূপকথার রাক্ষসের এক ফোঁটা রক্ত থেকে জন্মায় হাজার রাক্ষস আরও? এ সমস্ত বিষয় কখনও স্পষ্ট প্রমাণিত হবে না।

মেয়েটির মাথায় রুক্ষ চুল। গায়ে ময়লা ফ্রক। কাঁধ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে বারবার— এমনই ঢিলে। পৃথকভাবে, ওই মা বিনা, এই বিপুল জনসমারোহে তার অস্তিত্ব ক্ষীণ ও সামান্য।

তার মা তাকে মারছিল। কোনও বায়না সে করে থাকবে। কোনও খাদ্যলোভ। হয়তো ফুচকার প্রতি প্রীতি! কিংবা একমুঠো ভাজা বাদাম। কিংবা কোনও দুষ্টুমিও করে থাকতে পারে, যা তার এই বয়সের কাছে অভিপ্রেত। কিন্তু তার মা দারিদ্র্যে জর্জরিত, বায়না শোনে না, দুষ্টুমি সয় না।

ফুটপাথের ওপর গাছ লাগানোর জন্য মাটি ভর্তি চৌবাচ্চা। দু'চারটে কলাবতী ফুটে আছে। তার সামনে মা আর মেয়ে। মা প্রথমে মেয়েকে চড় মারল। তারপর সজোর ধাক্কা। মেয়ে ফুল ফোটানোর চৌবাচ্চায় কাত হয়ে পড়ল। মা লাথি মারল পেটে— যেন কচি পেট থেঁৎলে দিতে চায়। মেয়ে ছিটকে গেল একটু। মা মেয়ের চুল খামচে ধরে মাটিতে মাথা ঠুকে দিল। মেয়ে বিশাল হাঁ করে আছে। কাঁদছে। অথবা কাঁদতে চাইছে। যন্ত্রণায় শ্বাসরুদ্ধ। মুখ বন্ধ করতে পারছে না এবং অনেকক্ষণ শব্দ করতেও পারল না। কেন-না শব্দ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বাতাস নিতে পারছে না। হাওয়া অন্দরে যায় না, বাহিরেও আসে না যখন, এ-এক অদ্ভুত বদ্ধ অবস্থা। থেমে থাকা বিধুর। আর এর পরের ধাপ নির্মম হেঁচকি!

মায়ের হাত পুনরায় সক্রিয়। এলোপাথাড়ি মার মেয়েটিকে কুঁকড়ে দিল ত্রাসে ও যন্ত্রণায়। কান্নার ধাক্কায় তার দম এখনও আটকানো। এবার হেঁচকি তুলছে। তার ডান হাতের কনুই মাটিতে ঠেকানো। বাঁ হাত প্রতিরোধের ভঙ্গিতে সামনে। ক্ষুদ্র হাতখানি দিয়ে বিশাল আক্রমণ ঠেকাতে চাইছে। কাত হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। চোখ ভর্তি জল। মা আবার পা তুলেছিল। সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন। চোখ বন্ধ করলেই এই নৃশংস দৃশ্য থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন। এবং চোখ বন্ধ করেই তিনি জানালার কাচ তুলে দিয়েছিলেন। তাঁর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ির বন্ধ কাচে লেগে অনেক শব্দই

ফিরে যাচ্ছিল, আর সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে পড়েছিল আপন কন্যা শ্রীকে। আপন স্ত্রী রাগিণীকে। রাগিণী ও শ্রী। মা ও মেয়ে। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কোথাও এরকম প্রহার নেই। কেন নেই? কারণ দারিদ্র্য নেই। দারিদ্র্য যখন ছিল তখন কি এরকম প্রহার ছিল? দারিদ্র্য ছাড়া অন্য কিছুই কি পৃথিবীর মূল্যবান সম্পর্কগুলির মধ্যে প্রহার প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে না? ঈর্ষা পারে। প্রতিযোগিতা পারে। প্রভুত্বকামিতা পারে। পারে সেই অন্তঃসারশূন্য স্বার্থপরতাও।

মুহূর্তে ওই প্রতিরোধভঙ্গি ফিরে এসেছিল সুজয়ের স্মৃতিতে। এবং তৎক্ষণাৎ পুলক বিশ্বাস।

...পুলক, তুই আমার ছোটবেলার বন্ধু। আমরা একসঙ্গে ন্যাংটো পোঁদে গুলি খেলেছি। হাউরের মাঠে আমরা পাশাপাশি দৌড়েছি। ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দিয়েছি একসঙ্গে। জানাদের পুকুরে ছিপ ফেলে বসে থেকেছি কত দিন! একবার তুই মেরে আমার ঠোঁট ফাটিয়ে দিয়েছিলিস। একবার আমি মেরে তোর গালে সেলাই পরিয়েছিলাম। আমাদের মারামারি কাটাকাটি লেগেই ছিল, তবু আমাদের গলাগলিও ছিল। মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমি তোকে অঙ্কের অবজেকটিভ বলে দিয়েছিলাম। তুই আমাকে লাইফ সাইনসে সাহায্য করেছিলি। আমরা বন্ধুই ছিলাম। আমরা বন্ধুই ছিলাম ততদিন পর্যন্ত যতদিন আলাদা রাজনীতি ছিল না আমাদের। আলাদা মতবাদ ছিল না। আলাদা পন্থা ছিল না। পুলক, শুধুমাত্র ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদই কি বন্ধুকে শত্রু করে দিতে পারে?

ধুর। মতবাদ-টাদ সব ফক্কা। আসল কথা দখল। আসল কথা লক্ষ্য। শুধুমাত্র স্বার্থ অনুযায়ী লক্ষ্য তৈরি করা আর সেখানে পৌঁছনো। এর জন্য যা করতে হয় আমরা করব। পথ-ঘাট টপকে যাব। সব বাধা চূর্ণ করব। যেমন-যেমন পরিস্থিতি তেমন-তেমন সিদ্ধান্ত। প্রধান কথা লক্ষ্য জয় করতে সমস্ত প্রতিযোগীকে আমরা পরাজিত করব। যেমন আমি তোকে করেছি। যেমন তুই আমাকে করতে চেয়েছিলিস। তুই আমার শত্রু ছিলিস না, আমি তোর শত্রু ছিলাম না। আমরা বন্ধুও ছিলাম না পরস্পর। কিন্তু আমরা প্রতিযোগী ছিলাম। প্রতিযোগিতা শত্রুতার চেয়েও বেশি নোংরা। বেশি ভয়ংকর।

—দাদা, এবার কোন দিকে?

সুজয়ের ঘোর কাটছে। তিনি কি ঝিমিয়ে পড়েছিলেন? টালা পার্কের গায়ে এসে গাড়ি থামিয়েছে মঞ্জিল। সে রানি হর্ষমুখী রোড জানে না। সুজয়

বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে নির্দেশ দিয়ে নড়ে-চড়ে বসছেন। তিনিও দিব্যাঙ্গনার বাড়িতে আগে যাননি। তাঁর বন্ধু, ছবির ব্যবসায়ী অঞ্জন কর তাঁকে দিব্যাঙ্গনার সন্ধান দিয়েছেন। অঞ্জন করও কোনও দিন দিব্যাঙ্গনার বাড়িতে যাননি। তিনি শুধু সন্ধান রেখেছেন। কারণ প্রতি বছর শিল্পী প্রজিৎ মুখোপাধ্যায় তাঁর ছাত্রদের কাজের যে প্রদর্শনী করেন তার মধ্যে দু'বছর আগেও দিব্যাঙ্গনার ছবি তাঁকে মুগ্ধ করেছে।

ছবির ব্যবসাদারকে ছবির সমঝদার হতেই হবে তার কোনও মানে নেই। কিন্তু হলে ব্যবসা সাফল্যের অধিক হয়। শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর আঁকা সংগ্রহ ও কেনা-বেচাই নয়, ব্যবসার স্বার্থে চাই নতুন শিল্পী। নতুন হাত। তার জন্য খোঁজ রাখা চাই। নতুন শিল্পীর উপস্থাপনার হাতিয়ার হতে পারা গেলে সেই শিল্পীর সাফল্যের ওপর দীর্ঘকাল একচেটিয়া প্রতিপত্তি রাখতে পারা যায়। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের ছবির ক্রয়মূল্য বিক্রয়মূল্যের তুলনায় কম নয়। লাভ থাকে। কিন্তু বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়। সেই তুলনায় উঠতি শিল্পীদের ছবির বাজার অনেকটা তাঁতের শাড়ি বা মাছের ব্যবসার মতো। প্রথম যে কিনবে সে যা মূল্য দিচ্ছে, হাতবদল হতে হতে তা যখন বাজারে পৌঁছচ্ছে তখনকার মূল্যের সঙ্গে তার কোনও তুলনাই থাকছে না। ছবির বহু বেপরোয়া ক্রেতা এই বাজার ধরে রাখেন শিল্পীর খ্যাতির তোয়াক্কা না করে। তাঁরা শুধু ভাল লাগার বিনিময়ে অনায়াসে তুলে দেন কিছু সাবলীল অর্থ। এ ছাড়া আছে অফিসের সাজসজ্জা। বেশির ভাগ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দেখনদারির দিকে মন দিয়েছে। অন্দর-সজ্জার কাজে ছবি অপরিহার্য। নতুন আঁকিয়েদের খাঁটি চাহিদা এখানে।

অতএব, সমঝদারের চোখ থাকলে ব্যবসায়ীর লাভের ওপর লাভ বাড়ে। অঞ্জন করের সে-চোখ আছে। এবং সে-চোখের দৃষ্টিকে আরও আরও ফুটিয়ে তুলতে তিনি সচেষ্ট। সেই সচেষ্ট চোখ প্রজিৎ মুখোপাধ্যায়ের ছাত্র দিব্যাঙ্গনার আঁকার মধ্যে একটি নিখুঁত ভবিষ্যতের সন্ধান দিচ্ছে। যদিও গত দু'বছর যাবৎ দিব্যাঙ্গনা নামের মেয়েটি আর প্রজিতের কাছে আসছে না। বিয়ের পর তার শ্বশুরবাড়ি আঁকা সম্পর্কে এই অভিমত প্রকাশ করেছে যে—এঁকে কেউ বড়লোক হয়নি এবং আঁকা একটি ব্যয়বহুল বিলাসিতা।

যে ক'জন শিল্পীর নাম মশলাপাতির ব্র্যান্ডের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে ঢুকে পড়ে তাঁদের সম্পর্কে এইসব অভিমত প্রদানকারীরা বলে থাকে—'ওঁরা ব্যতিক্রম।' তার সঙ্গে এরকম কিছু বলতেও ভোলে না যে—ওঁর তো চোখটা ট্যারা...

—ওঁর তো নাকটা বাঁকা...

—ওঁর তো গলাটা বকের মতো...

— উনি তো ভুল ইংরিজি বলেন...

এইসব পর্যবেক্ষণকারীর দল, দিব্যাঙ্গনার শ্বশুরকুলে যাঁদের বাস, তাঁরা দিব্যাঙ্গনার মধ্যে ব্যতিক্রম হওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখেননি সুতরাং দিব্যাঙ্গনা অঙ্কন সংযত করেছে।

এত সব কথা সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় জেনেছেন অঞ্জন করের কাছে। অঞ্জন কর জেনেছেন প্রজিৎ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। প্রজিৎকে বলেছে দিব্যাঙ্গনা। টেলিফোনে। মাঝে মাঝে। ফাঁক পেলে। কারণ শ্বশুরবাড়িতে খুশিমতো যখন-তখন ফোন করার স্বাধীনতা তার নেই।

দিব্যাঙ্গনা কি আঁকা ছেড়ে দেয়নি এখনও? এই প্রশ্ন সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় অঞ্জন করকে করেছিলেন। উত্তর ছিল—হতে পারে, নাও হতে পারে। যদি দিব্যাঙ্গনা দু'বছর নাও আঁকেন, কিছু এসে যায় না। কারণ আমি ওঁর আঁকা দেখেছি। ওঁকেও দেখেছি। ওই শক্তি ফুরোবার নয়। আপনি ওঁকে ছবি দিতে বলুন।

অতএব সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় দিব্যাঙ্গনার বাড়ি যাচ্ছেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে সুজয়ের কিছু নির্দিষ্ট প্রবণতা আছে। যেমন, অজানিত কোনও পরিস্থিতি কিংবা মানুষের মুখোমুখি হওয়ার আগে তিনি সে-সম্পর্কে সম্ভাব্য খোঁজ-খবর নিয়ে থাকেন। দিব্যাঙ্গনা সম্পর্কেও সেইসব খোঁজ সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়েছেন এবং ছবি-বিষয়ের মতো অঞ্জন কর সেক্ষেত্রেও তাঁদের বন্ধুত্ব প্রমাণিত করে সহায়তা করেছেন। এ কারণে সুজয় অঞ্জনের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং নিশ্চিতও এ কারণে যে তাঁর আর অঞ্জনের ব্যবসার প্রকার সম্পূর্ণ পৃথক। সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় যে-বস্তুর ব্যবসা করেন তা প্রাচীন, জনপ্রিয় এবং কলঙ্কিত। ছবির প্রদর্শনী করা সুজয়ের শখ। বিশুদ্ধ শখ এবং তার সঙ্গে মিশে আছে কিছু স্বার্থ। দুই মিলে এ এক প্রকৃত শখের রূপ কিংবা অবস্থান।

দিব্যাঙ্গনার বয়স তেইশ-চব্বিশ। বাবা-মা নেই। দাদা-বউদির সঙ্গে থাকত যতদিন তার বিয়ে হয়নি। দাদা ভারতের খাদ্য নিগমের নিচু সারির করণিক। বউদি গৃহবধূ। দিব্যাঙ্গনার বাবাও সরকারি চাকুরে ছিলেন। জীবনবিমায়। হাওড়ার আমতলায় একটি বাড়ি করেছেন এবং দিব্যাঙ্গনার বিয়ের জন্য ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রেখেছেন। সেই টাকাতেই দিব্যাঙ্গনা একজন স্থপতিকে বিয়ে করে ঘরকন্না করছে। তার শ্বশুরবাড়ি উন্নাসিক এবং রক্ষণশীল। কিছুটা

অসংস্কৃতও। খাদ্য, অর্থ, নিরাপত্তার বাইরের কোনও কিছুতে তাঁদের রুচি নেই। দিব্যাঙ্গনাকে তাঁরা একজন সুশীল, শান্ত, নির্বিরোধী এবং ব্যক্তিত্ববিস্মৃত মানুষ হিসেবে দেখতে পছন্দ করেন। এবং বিশ্বাস করেন, একটি নিরুপদ্রব পরিবার তখনই সম্ভব যখন মেয়েরা লক্ষ্মী, শান্ত, শ্রীময়ী, নির্বিরোধী। কোনও স্বপ্ন না থাকা কেবল মাতৃত্ব ব্যতিরেকে। কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকা, স্বামীর মঙ্গল বিনা। এবং সাত চড়ে একটিও রা না কাড়া বিশ্বস্ত কপোল।

দিব্যাঙ্গনা ছবি আঁকা ছাড়া আর কিছুই জানে না। শ্বশুরবাড়িতে যখন এই জানা সমাদৃত হয়নি তখন অন্য কিছু সন্ধান করা প্রয়োজন। দিব্যাঙ্গনার কোন গুণ তাঁদের মুগ্ধ করেছিল? যার ফলে সে একজন স্থপতি স্বামী সংগ্রহ করল? চেহারাকে এ ক্ষেত্রে একটি গুণ বলাই যায় কারণ বিয়ের বাজারে মেয়েরা এখনও রূপে বিকোয়। আর? বাবার রেখে যাওয়া টাকা থেকে পঁচাত্তর হাজারের যৌতুক। না, যৌতুক নয়। সাহায্য। সহায়তা। যৌতুক বললে আইন অমান্য করা হয়। অতএব সহায়তা।

সহায়তা মাধ্যমে বিয়ে করতে শিল্পী দিব্যাঙ্গনা প্রথমে রাজি ছিল না। কিন্তু রাজি না হয়ে তার উপায়ও ছিল না কারণ আঁকা-আঁকা করে পাগল ননদ নিয়ে বউদিও পাগল হতে বসেছিলেন। দিব্যাঙ্গনা অতি সহজ পন্থায় দাদা-বউদিকে মুক্তি দিয়েছিল।

তা হলে? সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সঙ্গে নিজে আলোচনা করছিলেন। তা হলে?

...তা হলে শিল্পী দিব্যাঙ্গনাকে হত্যা করার বিরুদ্ধে আমি একটি অভিযান চালাতে পারি। আমার প্রদর্শনী সুন্দর ও সফল হলে আমার মৃত শিল্পীসত্তা তুষ্ট হতে পারে। এ ছাড়া আরও অনেক কিছু। কিন্তু কীভাবে দিব্যাঙ্গনাকে নেওয়া যায়? ওর শ্বশুরবাড়িতে আপত্তি উঠতে পারে। তা হলে আপত্তি খণ্ডাবার উপায় ভাবতে হবে। কী উপায়? ঠিক যে-উপায়ে আমি আমার ব্যবসার সমস্ত বাধা দূর করে থাকি সে-উপায়ে। আপত্তিকারীর দুর্বল জায়গা অনুসন্ধান করে।

অসংস্কৃতও। খাদ্য, অর্থ, নিরাপত্তার বাইরের কোনও কিছুতে তাঁদের রুচি নেই। দিব্যাঙ্গনাকে তাঁরা একজন সুশীল, শান্ত, নির্বিরোধী এবং ব্যক্তিত্ববিস্মৃত মানুষ হিসেবে দেখতে পছন্দ করেন। এবং বিশ্বাস করেন, একটি নিরুপদ্রব পরিবার তখনই সম্ভব যখন মেয়েরা লক্ষ্মী, শান্ত, শ্রীময়ী, নির্বিরোধী। কোনও স্বপ্ন না থাকা কেবল মাতৃত্ব ব্যতিরেকে। কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকা, স্বামীর মঙ্গল বিনা। এবং সাত চড়ে একটিও রা না কাড়া বিশ্বস্ত কপোল।

দিব্যাঙ্গনা ছবি আঁকা ছাড়া আর কিছুই জানে না। শ্বশুরবাড়িতে যখন এই জানা সমাদৃত হয়নি তখন অন্য কিছু সন্ধান করা প্রয়োজন। দিব্যাঙ্গনার কোন গুণ তাঁদের মুগ্ধ করেছিল? যার ফলে সে একজন স্থপতি স্বামী সংগ্রহ করল? চেহারাকে এ ক্ষেত্রে একটি গুণ বলাই যায় কারণ বিয়ের বাজারে মেয়েরা এখনও রূপে বিকোয়। আর? বাবার রেখে যাওয়া টাকা থেকে পঁচাত্তর হাজারের যৌতুক। না, যৌতুক নয়। সাহায্য। সহায়তা। যৌতুক বললে আইন অমান্য করা হয়। অতএব সহায়তা।

সহায়তা মাধ্যমে বিয়ে করতে শিল্পী দিব্যাঙ্গনা প্রথমে রাজি ছিল না। কিন্তু রাজি না হয়ে তার উপায়ও ছিল না কারণ আঁকা-আঁকা করে পাগল ননদ নিয়ে বউদিও পাগল হতে বসেছিলেন। দিব্যাঙ্গনা অতি সহজ পন্থায় দাদা-বউদিকে মুক্তি দিয়েছিল।

তা হলে? সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সঙ্গে নিজে আলোচনা করছিলেন। তা হলে?

...তা হলে শিল্পী দিব্যাঙ্গনাকে হত্যা করার বিরুদ্ধে আমি একটি অভিযান চালাতে পারি। আমার প্রদর্শনী সুন্দর ও সফল হলে আমার মৃত শিল্পীসত্তা তুষ্ট হতে পারে। এ ছাড়া আরও অনেক কিছু। কিন্তু কীভাবে দিব্যাঙ্গনাকে নেওয়া যায়? ওর শ্বশুরবাড়িতে আপত্তি উঠতে পারে। তা হলে আপত্তি খণ্ডাবার উপায় ভাবতে হবে। কী উপায়? ঠিক যে-উপায়ে আমি আমার ব্যবসার সমস্ত বাধা দূর করে থাকি সে-উপায়ে। আপত্তিকারীর দুর্বল জায়গা অনুসন্ধান করে।

দুই

সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্জিলকেই গাড়ি থেকে নামতে আদেশ করলেন। মঞ্জিল যথানিয়মে দরজাঘণ্টি বাজাল। সুজয় গাড়ির জানালার কাচ নামিয়েছেন। দেখছেন। বারান্দায় আপাদমস্তক গ্রিল দেওয়া বাক্স প্যাটার্নের বাড়ি। দ্বিতল। চটক নেই। এমনকী কোনও নান্দনিকতাও না। এই বাড়িকে কী বলা যেতে পারে?

...ইহা বাসস্থান। বাসভবন নহে। কেন নহে? ইহা কী দোষ করিল যে ভবন বলিতে দূষণীয় হইল? কী তফাত বাসভবনে আর বাসস্থানে?...

বাসস্থান—বেশির ভাগ মানুষের কাছেই শুধুমাত্র মাথাগোঁজার ঠাঁই। চারটি পুরু দেওয়াল ও একটি ভরাট ছাদ হলেই হল। অর্থাৎ একটি গৃহ নির্মাণের পর তাকে সুদৃশ্য করে তোলার দায় থাকে না। দেওয়ালে যেখানে-সেখানে পেরেক পোঁতা যায়। ঝুলিয়ে দেওয়া যায় বিবিধ ঠাকুর-দেবতার ক্যালেন্ডার। গৃহস্থ মানুষ, তারা ঠাকুর-দেবতার ছবি আঁকা ক্যালেন্ডার গুটিয়ে রাখতে পারে না। টাঙিয়ে দেয়। আর তার পাশেই থাকে ঠাকুরদাদার ছবি। কিংবা দার্জিলিঙের পাহাড়। কোনও এক কালে ভুটান থেকে কিনে আনা রাক্ষসের মুখোশও থাকে অথবা মুখ থেকে প্রগলভ আগুন বের করা ক্রুদ্ধ ড্রাগন। পবিত্র ড্রাগন। বীভৎস পবিত্রতা অল্প অল্প দোলে হাওয়ায়। খাটের পায়া দরকার মতো উঁচু করে নেওয়া হয় ইঁট দিয়ে। দেওয়ালের রং চটে গেলে কারও বিয়ে না লাগা পর্যন্ত আর রং ফেরে না। পর্দা বিবর্ণ হয়ে গেলে কারও মন-খারাপ করে না। ছাতে শ্যাওলা ধরে যায়। স্যাঁতসেতে বাথরুমে হলুদ ছোপ। সাবানের বাক্স নেই। কাগজের মোড়কটি বিছিয়েই সাবান বিরাজমান। আর সাবানের ভেজা ফেনার জল শোষণ করে সে-কাগজ করুণ নরম। ল্যাতল্যাতে। দুয়ারে, চৌকাঠের কোণে মাটি খুঁড়ে স্তূপ করে রাখে পিঁপড়েরা। উইপোকা নিজস্ব ঘরের বিষে বিষাক্ত শাখাপ্রশাখা নিয়ে ফোঁপরা করে দেয় দেওয়াল কন্দর।

এই হল বাসস্থান। এ হল প্রয়োজনের তাগিদ। প্রাকৃতিক নিত্যকর্মের মতো। আর বাসভবন হল মনের শান্তি, প্রাণের আরাম। বাসভবন শিল্পসুষমামণ্ডিত। বিবিধ সংগ্রহের শিল্পবস্তু এখানে সুচিন্তিতভাবে সজ্জিত থাকে। পর্দার ভাঁজ একটুও কম-বেশি হয় না। মেঝের রঙে, দেওয়ালের রঙে, পর্দার রঙে, শয্যার

আবরণের রঙে কোথাও সামঞ্জস্যের অভাব থাকে না। এখানে জুতো জোড়াটিও এমনভাবে রাখা যে, চোখ স্নিগ্ধতা বোধ করে।

অতএব, সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্তে আসেন, দিব্যাঙ্গনার শ্বশুরালয় একটি বাসস্থানমাত্র। এবং তিনি গৃহের আপাদমস্তকে চোখ রাখার চেষ্টা করলেন। যদিও অন্ধকার নামার এ সেই প্রাক মুহূর্ত। যখন গভীর নীল হয়ে যাবে আকাশ। যখন শাঁখের শব্দ শোনা যাবে। বাড়িগুলির গায়ে, পথে এবং পথের ধারে শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে পড়বে সেই গভীর নীল রং! এই লগ্নে সময় কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ায়। যেন ভাবে, আজও এই গোলার্ধের সূর্যকে অস্ত যেতে দেবে কি না। এবং অস্ত যেতে দেয়। সময়ের সিদ্ধান্তে কোনও ব্যতিক্রম নেই। প্রতিদিন একটু একটু করে সে বর্তমানকে জরাগ্রস্ত করছে।

সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের হাতের দিকে তাকান। মসৃণ চামড়ার নীচে তাঁর সাঁইত্রিশ বছরের সফল বয়স। আয়নার কাছে দাঁড়ালে মনে হয় বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও সততার রেখায় আঁকা আত্মস্থ মুখ। মুখে, সুগন্ধী ল্যাকটোক্যালামিনের মৃদু গোলাপি আস্তরণের মতো নিষ্পাপ। এবং সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় আজও কোনও পাপ স্পর্শ করেননি। তিনি নিষ্পাপ এক মানুষ, একাকী, এই পৃথিবীতে বিরাজ করেন। এবং নিষ্পাপ দৃষ্টি তাঁর একটি চার বছরের বালকের ওপর নিপতিত হল। চার বছরই কি? চার কিংবা পাঁচ। ছয়ও হতে পারে। ঝলঝলে ছেঁড়া প্যান্ট! খালি গা! হাতে একটি কাঠি, শূন্যে ঘোরাতে ঘোরাতে চলেছে।

...আরে পুলক তুই! আবার তুই!

কত অসংখ্য পুলক আশে-পাশে ঘোরে। একেকদিন অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। পুলকের সব পাপ ধুয়ে-মুছে গেছে। অতএব সমস্ত চার বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার মধ্যে তার অবস্থান আপাতত বোঝা যাচ্ছে। এখন, সমস্ত পুলক ইডিপাস গুঁড়েযায় বিরাজ করছে। আত্মকামুক স্তরের পর, স্বকামুক স্তরের পর, এখন ওর ইডিপাস গুঁড়েষা। অদম থেকে অহং অর্জন করছে ক্রমশ।

...পাসিং থ্রু এ বোধহীন অটো এরোটিক স্টেজ, নার্সিসিস্টিক স্টেজ এবং কারেন্টলি থ্রু ইডিপাস কমপ্লেক্স। বোধহীন কামস্তরের নিষ্পাপ অবস্থা।

আহা! কী চমৎকার ব্যাখ্যা! সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য কিনা তা নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর অধিশাস্তা চমৎকার! অতএব একজন পবিত্র সংবেদনশীল সামাজিক মানুষ হিসেবে তাঁর তুলনা বিরল, অবচেতনে এই আত্মবিশ্বাস তাঁর আছে এবং তিনি চেতনায় পাপ স্পর্শ

করেননি। কিন্তু তাঁর চারপাশে প্রকৃতপক্ষে পাপী মানুষের ভিড়। নিষ্পাপ ও পুণ্যবান নেই কেউ? নিষ্পাপে ও পুণ্যবানে পার্থক্যই বা কী!

...নিষ্পাপ—যাকে পাপ স্পর্শ করেনি। পুণ্যবান—যে পুণ্য অর্জন করেছে। শূন্যকে মধ্যবর্তী ধরলে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক সংখ্যার মতো এক অবস্থান। নিষ্পাপ এক শূন্য অবস্থা। যে পাপ করতে করতে চলেছে সে ক্রমশ ঋণাত্মক হতে হতে চলল। পুণ্যবান মানুষেরা ধনাত্মক আলোকরশ্মি দ্বারা বিভাসিত।

তা হলে, সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারপাশে পুণ্যবানই বা কে আর কে-ই বা নিষ্পাপ? অঞ্জন কর—ব্যবসাদার হলেও শিল্পপ্রেমিক, শিল্পীর প্রতিপালন এবং সমঝদার হিসেবে তিনি অবশ্যই একজন পুণ্যবান মানুষ! এবং জয়শঙ্কর নিষ্পাপ জন। পাপ তাকে স্পর্শ করেনি। বস্তুত, পাপ কোনও মানুষকেই স্পর্শ করে না। মানুষই পাপকে স্পর্শ করে এবং কলুষিত হয়। পাপের নিজস্ব অবস্থানেই মতি। পাপ কারও পশ্চাতে ধাবমান নয়। মানুষ স্বয়ং পাপে আকৃষ্ট, পাপে ধাবিত। মানুষ পাপকে স্পর্শ করলে পাপও কলুষিত হয়। অতএব মানুষ এবং পাপ পরস্পর কলুষকারক তীব্র নষ্টক!

—কাকে চাই?

একটি কর্কশ কণ্ঠ সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে সচকিত করে তুলল। তিনি লক্ষ করলেন, মঞ্জিল অত্যন্ত সপ্রতিভতায় প্রশ্ন করছে—এটা দিব্যাঙ্গনাদির বাড়ি তো?

সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ খোলা জানালায় মহিলার মুখ। ভাঙা-চোরা মুখে আলো-আঁধারি কিছু গহ্বরের সৃষ্টি করছে। জিজ্ঞাসা ও অভিব্যক্তিতে অনিবার্য তামস।

—হ্যাঁ, এটা দিব্যাঙ্গনার শ্বশুরবাড়ি। কেন? কী ব্যাপার?

মঞ্জিল এবার সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে তাকাল। সুজয় দরজা খুলে নেমে এলেন। বললেন—আজ্ঞে মাসিমা, নমস্কার, আমি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যাডামের সঙ্গে ছবির বিষয়ে কিছু কথা বলতে এসেছিলাম।

—ছবি? কার? বউমার? কী কারণে? কী ছবি?

মহিলা ল্যান্ডিং-এর জানালায় অনড়। সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পারলেন, সময় লাগবে। মঞ্জিলকে গাড়িটা এক ধারে রাখতে নির্দেশ দিলেন তিনি। নামের সঙ্গে রোড জুড়ে আছে কিন্তু তেমন প্রশস্ত নয় রাস্তাটা। মহিলা এতক্ষণে সন্দেহ খানিকটা জয় করে, ভদ্রতাবোধ দ্বারা কিছুটা পরাভূত হয়ে দরজা খুললেন এবং গ্রিলঘেরা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। গ্রিলের দরজায় বড় তালা

ঝুলছে। তাঁর কলপিত চুল খোলা, হাতকাটা ব্লাউজ কালো, বড় বড় দুটি সোনার গয়না কানপাশা ইত্যাদি সমেত গাঢ় কাজল পরা চোখে তিনি জরিপ করলেন সুজয়, মঞ্জিল, গাড়ি এবং সুজয়ের আত্মবিশ্বস্ত ভঙ্গি অবশ্যই, কারণ, তিনি গ্রিলগেটের তালা খুলে সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভেতরে আসতে আবাহন করলেন। এবং সুজয় তাঁর কিছুক্ষণ আগেকার অনুমানমতো একটি অশৈল্পিক বসার ঘরে প্রবেশ দিলেন। মহিলা তাঁকে 'বসুন' কথাটি বললেন কি বললেন না, সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় একটি টান-টান সোফায় নিরুত্তেজিত বসে পড়লেন অনেক বেশি কথা বলার প্রয়োজনীয়তাবোধ সমেত। এবং শুনলেন কার্কশ্যে উচ্চারিত বাক্য—শুনছ, এদিকে শোনো একবার। বউমা, শুনতে পাচ্ছ, এদিকে এসো, দ্যাখো, কে এসেছে...!

'এসেছে' বলার মধ্যে কিছু অভক্তি ও তাচ্ছিল্য। বিরক্তিও সম্ভবত কেননা বউমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কোনও পুরুষ, গাড়ি চেপে, ছবির বিষয়ে— এতখানি গুরুত্ব অসম্মানজনক হতে পারে। সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবেন এবং তন্ময় হয়ে যান।

...লিবিডো বিবর্তনের শেষ ধাপে পৌঁছে যাওয়া এইসব মহিলা বা পুরুষ সমস্ত পৃথিবীতে শুধু লিঙ্গ দেখতে পায়। সততা-অসততা, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় সমস্ত কিছুরই শেষ বিচার এদের কাছে লিঙ্গভিত্তিক। এমনকী এদের শিল্প, সাহিত্য, সংগীতবোধও লিঙ্গ দ্বারা নির্ণীত ও বিচার্য হয়।

অর্থাৎ কিনা, এদের দৃষ্টি ত্বক ভেদ করেনি, রক্তের ঝরনা পেরোয়নি, হাড়ের কাঠামোকে মনে করেছে মানুষ। দেহাতীত নিয়েই যে দেহ আসলে, তার কোনও বোধই এদের নেই। দেহবন্ধবিমুক্তির নিমিত্ত এরা গঙ্গায় ডুবে, সাগের ডুবে, পুণ্যজলে সিক্ত হয় এবং আবার মল-মূত্র-রক্ত-কফের আবর্তে এসে ঢুকে। ঢুকে, মানে ঢোকে মানে ঢুকতে চায়। তা ছাড়া আর কোথায় যাবে! যাওয়া যে যায়— সেই বোধই নাই। বোধ নাই, বুদ্ধি আছে। দেহবুদ্ধি। লিঙ্গবুদ্ধি। জাতবুদ্ধি। সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় এই বুদ্ধি বিষয়ে ভাবতে ভাবতে, দেখতে দেখতে প্রতীক্ষা করছিলেন।

কিছুক্ষণ পর দিব্যাঙ্গনা নামের রোগা, রিক্ত, সুদৃশ্য মেয়েটি ঘরে এসে নমস্কার করে দাঁড়াল। সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় বসা অবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে